বিদ্যাসাগর।

VIDYASAGARA.

COMPILED FROM

A SUCCESSFUL COMPETITIVE ESSAY

ON

HIS GENIUS AND SELF-SACRIFICE IN THE FIELD OF ACTION.

BY

Pundit Jnanendra Chandra Chatterjea

Kaviratna.

Sanskrit Lecturer, Midnapore College.

Published by

P. CHATTERJEE

Hooghly

Price 6 Annas.

বিদ্যাসাগর।

L.1.13
8 - FEB 1910
PRESIDENCY COLLEGE

পণ্ডিত শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন।

বিদ্যাসাগর।

VIDYASAGARA.

COMPILED FROM

A SUCCESSFUL COMPETITIVE ESSAY

ON

HIS GENIUS AND SELF-SACRIFICE IN THE FIELD OF ACTION.

BY

Pundit Jnanendra Chandra Chatterjea

Kaviratna.

Sanskrit Lecturer, Midnapore College.

Published by

P. CHATTERJEE

Hooghly

Price 6 Annas.

দ্বিতীয় সংস্করণের

বিজ্ঞাপন।

—:•:—

প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী বন্ধুবর্গের অনুরোধে "বিদ্যাসাগর" দ্বিতীয়-বার প্রচারিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাষার বৈশিষ্ট্যসম্পাদনের জন্য এবং সুকুমার-মতি বালকবালিকাগণের বোধসৌকর্য্যার্থে যে যে বিষয়ের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছে, এই বার তাহা করা গেল। সংস্কৃত শ্লোকগুলি একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু পুস্তকের কলেবরে তৎতৎস্থানে বঙ্গানুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দীর্ঘকাল যাবত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চায়—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে—ব্যাপৃত থাকায় অগ্রজমহাশয়ের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে এই প্রবন্ধের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও বিষয়বিন্যাসের পারিপাট্যে তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইবে। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক বিদ্যা-লয়ের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হইয়া বিদ্যার্থিবৃন্দের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকারে আসিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

হুগলী
১৩১৬। অগ্রহায়ণ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা।

আমাদের হুগলী বিদ্যাসাগর পাঠাগারের চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনসময়ে, বিগত শ্রাবণ মাসে, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভা ও কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মত্যাগ" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখায় ঢাকা ইছাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটা রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। কাশীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় নিজ ব্যয়ে এই পদক প্রদান করিয়া আমাদিগকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক-জন বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের উৎসাহ ও উপদেশে সেই প্রবন্ধই এই "বিদ্যাসাগর" রূপে প্রকাশিত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে যাঁহারা প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন, লেখক তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জনের প্রবন্ধ হইতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থই তাঁহার প্রধান অবলম্বন; তদ্ব্যতীত লেখকবর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহোদয়ের প্রবন্ধাদি হইতেও স্থানে স্থানে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। সকল ঠিক বুঝিতে না পারায়, আমরা পরবাক্যবোধক চিহ্ন দ্বারা উদ্ধৃত স্থল সকল চিহ্নিত করিয়া দিতে পারি নাই। আশা করি, তাঁহারা উভয়েই আপনাপন মহানুভবতার গুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; আমরা তজ্জন্য তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুবৃহৎ জীবনচরিত কয়েকখানিই শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে

বালিকাগণের উপযুক্ত ক্ষুদ্রাকারে কোন পুস্তকই এতাবৎ প্রচারিত হয় নাই। যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" পড়িয়াই, দেশের বালকবালিকাগণের বর্ণপরিচয় হয়, যাঁহার বোধোদয়েই তাহাদিগের বোধোদয় হয়, পরবর্ত্তিকালেও একমাত্র যাঁহার গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াই তাহারা জীবনের সমগ্র সময় অতিবাহিত করে এবং যাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণনিচয়ের নিরুপম আদর্শ গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই পূজা করিয়া থাকেন, সেই "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" মহাশয়ের জীবনী কি শৈশব হইতেই তাহাদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক হইবে না? আমরা সেই আশায় প্রণোদিত হইয়াই এই গ্রন্থ প্রচার করিলাম; এতদ্দ্বারা সে অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীভূত হইলেও আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হুগলী
বিদ্যাসাগর পাঠাগার
১৩০৫। আশ্বিন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

BENGAL LIBRARY
9 - FEB. 1910
WRITERS' BUILDINGS.

বিদ্যাসাগর।

(তাঁহার প্রতিভা ও কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মত্যাগ)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(শৈশবে)

—:(:০:):—

জগতে মানবজীবন অনিত্য। মানবসাধারণ জন্মমৃত্যুর অধীন। মানব কালস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে, আবার যাইতেছে; জন্ম হইলে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম অবধারিত। মানব কোথা হইতে আসিতেছে—আবার কোথায় যাইতেছে এই তত্ত্বের উদ্ভেদ করা বড় সহজ নহে। তবে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যতদিন সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া মানব আপন আপন কার্য্য-কলাপ বিস্তার করে, ততদিনই সে জনসাধারণে পরিচিত হইয়া থাকে; কর্ম্মই তাহার পরিচয়ের মূল। কর্ম্মবিরহিত লোক নাই; কর্ম্মব্যতিরেকে মুহূর্ত্তমাত্রও কেহ অবস্থান করিতে পারে না।

জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই মানবের জীবিতকাল অর্থাৎ আয়ুঃ। এই অত্যল্পপরিমিত আয়ুষ্কালে সে মানবরূপে কি করিতে পারে? কেহ কেহ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্ত ইতরপশুবৎ আহারবিহারাদিরূপ নিজের দৈহিককর্ম্মেই

জীবন পর্য্যবসিত করে। তাহাদের নাম ও কর্ম্ম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই—জলে জলবিম্ববৎ—বিলীন হইয়া যায়। কেহ কেহ বা আবার ভগবানের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্র-অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই লীলা প্রকাশচ্ছলে সংসার-ক্ষেত্রের শত শত বাধাবিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক নিজ নিজ প্রতিভাময়কার্য্যকলাপের সুস্নিগ্ধজ্যোতিতে দিগ্‌দিগন্তস্থিত পথ-ভ্রান্ত পথিকের গন্তব্যপথ আলোকিত করিয়া, সংসারলীলা সমাপনান্তে তাঁহাতেই চিরবিলয় প্রাপ্ত হন; সেই ধন্য মহাত্মা-দিগকে আর জগতে ফিরিতে হয় না; আর ভবযন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় না। এইপ্রকার ব্যক্তিই প্রকৃত মহাপুরুষ পদবাচ্য। ইহাঁদের নাম সঙ্গে সঙ্গে বিলীন না হইয়া চিরকাল সংসারের চিত্রপটে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত থাকে। এই মর্ত্ত্যলোকে তাঁহারাই একমাত্র অমর বলিয়া পরিগণিত হয়েন। কারণ, ধন, জন, জীবন, যৌবন সকলই চঞ্চল। কীর্ত্তিমান্ পুরুষই অবিনশ্বর। সুকর্ম্মজনিত সুযশঃ ভিন্ন আর কিছুই চিরস্থায়ী নহে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অবনীমণ্ডলে এবংবিধ মহাপুরুষের আবির্ভাব অতি বিরল। আমাদের সন্দর্ভের শিরোভাগে যে মহাপুরুষের মহিমান্বিত নাম অঙ্কিত রহিয়াছে ইনি একালের এক জন যথার্থ মহাপুরুষ।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল ব্যক্তি ভবিষ্য-জ্জীবনে স্বীয় স্বীয় অলৌকিক-ঔদার্য্যময় কার্য্যবলে মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাঁহারা প্রায়ই সামান্যাবস্থায় অবনী-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে নিজ নিজ শক্তি-প্রভাবে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাতঃ-

স্মরণীয় সর্ব্বজনপরিচিত "বিদ্যাসাগর" মহাশয়ও সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র ১৭৪২ শকে, ইংরাজী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙ্গালা ১২২৭ সনে ১২ আশ্বিন তারিখে মঙ্গলবারে, মানবের মঙ্গল সাধন করিতেই যেন, ক্ষিতিতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মাতার নাম ভগবতী দেবী। বীরসিংহে ফলতঃ "বীরসিংহেরই" অভ্যুদয় হইয়াছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে শৈশবাবস্থা হইতেই সর্ব্ব-মঙ্গলার সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী ও সর্ব্বপ্রভাব-শালিনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। বাল্যজীবনেই মানবের ভাবিভাবসমুদায়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। 'উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবন সার্থক করিব' 'অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতার দুঃখ বিমোচন করিব', 'ত্যাগ স্বীকার করিয়া দারিদ্র্য-ক্লেশনিষ্পেষিত দীনহীন মনুষ্যের ক্লেশ নিবারণ করিব', 'অজ্ঞতা ও কুসংস্কাররূপ গাঢ় অন্ধকার দেশ হইতে অপনয়ন করিয়া, প্রজ্ঞা ও উৎসাহবলে তৎ-তৎস্থানে সৎজ্ঞান ও সুসংস্কাররূপ সুস্নিগ্ধ আলোকের অভ্যুদয় দেখাইব'—এই সকল সৎপ্রবৃত্তি শিশুকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরে স্বতঃই আসিয়া উদ্রিক্ত হইয়াছিল। কথায় বলে 'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়'—ঈশ্বর-চন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। অর্থহীন পিতা জ্ঞানপিপাসু পুত্রের বিদ্যাশিক্ষোপযোগী ব্যয়ভারসম্পাদনে অসমর্থ হইলে পুত্রকে যেরূপ দুঃখ, ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, ঈশ্বরচন্দ্রকেও সেইরূপ যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অমিত অধ্যবসায় ও অত্যাশ্চর্য্য মানসী শক্তি, অপ্রতিহত আন্তরিক আগ্রহ ও

অনন্যসাধারণ কর্ম্মচেষ্টা এবং অবিচলিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সকল বাধাবিঘ্নের উচ্ছেদ সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিমন্দিরের দুরুদ্ঘাটনীয় দ্বার তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। যিনি প্রজ্ঞাবলে বলীয়ান্, সুমন্ত্রণা যাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, উৎসাহবলে যিনি আত্মোদয় করিতে শিখিয়াছেন, তিনিই মহান্। সংসারসমরাঙ্গনে জয়লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইয়া থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। দরিদ্রতার সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে তাঁহার সমস্ত বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র স্বকীয় প্রজ্ঞোৎসাহবলে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কোটীশ্বর পুরুষ অশেষবিধ ধনজনবলে যে সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন না, একজন নিরন্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও তিনি সেই সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই লোকাতিগ মহিমার একমাত্র গূঢ় কারণ এই যে, অমিত মানসী শক্তির সহিত তাঁহার মহীয়সী হৃদয়বত্তার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। ধনগর্ব্বিত বা ক্ষমতাদৃপ্ত লক্ষপতির নিকট তিনি যেরূপ নির্ভীক, অবিচলিত মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন, চিরদরিদ্র অনাথের নিকটও তিনি সেইরূপ সুস্নিগ্ধ শশধরের ন্যায় প্রশান্তভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন; সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শি-গণ্যমান্য পণ্ডিত সমাজে তিনি যেমন হৃদয়গ্রাহী বিনীতভাব অবলম্বন করিতেন, নিরক্ষর মূর্খলোকের নিকটও তিনি সেইরূপই নিরহঙ্কারিতার পরিচয় দিতেন। একদিকে তিনি যেরূপ মনস্বী ও স্পষ্টবাদী অন্যদিকে সেইরূপ হৃদয়বান্ ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। একাধারে এতাদৃশ পরস্পরবিরোধী অসাধারণ

গুণসমষ্টির অপূর্ব্বসম্মিলন বর্ত্তমানসময়ে মানবহৃদয়ে দেখিতে পাওয়া নিতান্ত দুর্লভ। দানশীলতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি উচ্চান্তঃকরণের মনুষ্যোচিত যাবতীয় সদ্‌গুণ তাঁহাকে সমলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র কিরূপে দুঃখনিপীড়িত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজাধিকৃত বিপুল ভারতসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সমভাবে গণনীয় ও পূজনীয় হইয়াছিলেন, এবং কি প্রতিভা প্রভাবেই বা তিনি দেশে ও বিদেশে এতাধিক সম্মানার্হ এবং ক্ষমতাশালী হইয়া ত্যাগ স্বীকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানবজীবনের পরিণত কার্য্যকলাপ শৈশবকালের কার্য্যাবলী হইতেই অনুমেয় হইয়া থাকে। তাই আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের সমালোচনা করিয়া তাঁহার উত্তরজীবনের প্রতিভা, মহত্ত্ব ও পরোপকার প্রভৃতির আভাস দেখাইব।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় থাকিতেন। পুত্র জন্মাবধি জন্মভূমি বীরসিংহেই অবস্থান করিতেন। ইংরাজী ১৮২৯ সালের ১লা জুন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্রের নয়বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইতঃপূর্ব্বে বালক আর সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন নাই; কলেজে ভর্ত্তি হইয়াই প্রথানুসারে প্রথমে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বাল্যকালেই লোকের চরিত্র সংগঠিত হইয়া থাকে। আপন পুত্র পাছে কুসংসর্গে মিশিয়া পথে খেলা করিয়া কালহরণ করে, বা কর্ত্তব্য পাঠে হতাদর হয়, সেইজন্য

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজেই সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে দিয়া আসিতেন ; পাঠান্তসময়ে পুনরায় গিয়া লইয়া আসিতেন।

আপামরসাধারণ লোকের পক্ষে যাহা প্রধান দোষ, ভবিষ্যতে প্রতিভাশালী ক্ষমতাবান্ মহাপুরুষের পক্ষে তাহাই প্রধান গুণরূপে পরিগণিত হইয়া তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ-সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে। অন্যলোকে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, নিজের জেদের বশবর্ত্তী হইলে, অপর দশজনের উপরোধ অনুরোধ উপেক্ষা করিলে, নিন্দাভাজন হয় ; কিন্তু সংসারে সময়ে সময়ে এইপ্রকারও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে যে দশজনের বা শতজনের বিদ্যাবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শন একত্র করিলেও প্রতিভাশালী মহাত্মগণ তাহার সম্মুখে কোন-রূপেই অপদস্থ হয়েন না। কাজে কাজেই তাঁহারা সমধিক-পরিমাণে নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। আমাদিগের বালক ঈশ্বরচন্দ্রেরও জীবনপ্রভাত হইতেই ঐরূপ আত্মনির্ভরতার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কাহারও সাহায্য না লইয়া বিদ্যালয়ে সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিবেন, তিনি এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা অবিরল পরিচালিত হইতেন। একদিকে দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণ—অন্যদিকে আত্মোন্নতির জলন্ত উৎসাহ।

সংসারে দশজনের অনুগ্রহভাজন না হইয়া অন্যের সহায়তা লাভ না করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া অতীব কঠিন ব্যাপার ; বিশেষতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় নিরন্ন দরিদ্র বালকের পক্ষে সেকালে এইরূপ আত্মনির্ভরতা আরও বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। উত্তরকালে বহু-বন্ধু-

পরিবেষ্টিত হইয়াও, শৈশবে তিনি একাকীই জীবন-সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কোনও বালক শ্রমশীলতায়, দৃঢ়তায় বা বুদ্ধিমত্তায় তাঁহাকে পরাজয় করিবে—স্বাধীনচেতা ঈশ্বরচন্দ্র তাহা কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক, সেখানে তাঁহার জিগীষার উত্তেজনা ও বিজয়ের আয়োজন তদপেক্ষা শত শত গুণে বর্দ্ধিত হইত। বালক—কি শৈশবে, কি পঠদ্দশায়, কি উত্তরকালে, কর্ম্মক্ষেত্রসংসারে কিম্বা অপর কোনও বিশেষ ঘটনাতে—কোথাও কাহারও পশ্চাতে পড়িতে ঘৃণা বোধ করিতেন। চিরদিন সমভাবে আপনার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে তিনি সতত যত্ন-পরায়ণ ছিলেন এবং তাঁহার সেই যত্নও সর্ব্বদাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-নুরূপ ফলপ্রদান করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। বাস্তবিক, এইপ্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্ম-নির্ভরতা সচরাচর সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। যে আত্মনির্ভরতার গুণে তিনি সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতেন, বিদ্যালয়ে পঠদ্দশাতেই তাঁহার সেই গুণ সমধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমরা এই সম্বন্ধে একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারি-লাম না। সংস্কৃত কলেজে ক্রমাগত দুই বৎসরকাল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে করিতে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চপদ অধিকার করিয়া উন্নীত হইতে থাকিলে, যখন তৃতীয়বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষা প্রদান করিয়া তিনি কোনও কারণবশতঃ সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিলেন না, তখন কলেজের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন। বস্তুতঃ শ্রমশীল অক্লিষ্টকর্ম্ম বালকের ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কথাই বটে! পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই বুঝাইতে লাগিলেন; বালক

বুঝিলেন না। মনঃস্থ করিয়াছেন—দেশে গিয়া টোলে পড়িবেন। অবশেষে অনেক বলার পর, অধ্যাপকগণের সস্নেহানুরোধে ও আত্মীয়তায় সেই অযথা সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া পিতার অভিমতক্রমে কলেজেই পড়িতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! লিখিতে লেখনী স্তম্ভিত হয়—জ্ঞানপিপাসু ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের পারিবারিক অবস্থা এতদূর শোচনীয় ছিল যে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—পিতৃদেবের যৎকিঞ্চিৎ আয়ে স্বচ্ছলভাবে সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ না হওয়ায় বাল্যকালে তাঁহাকে অনেক সময়ে উদরান্নের জন্যও চিন্তিত হইতে হইত। অনেক সময়ে পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইতেন না; ভাত পাইলেও তরকারী ইত্যাদি ঘটিত না। তাহাতে আবার পরিশ্রম করিতে হইত গুরুতর! নিজহস্তে তিনি কলিকাতাস্থ পরিবার-বর্গের রন্ধনাদি ত করিতেনই, তদ্ব্যতীত বাসার অন্যান্য তত্ত্বাবধারণ-সংশ্লিষ্ট সকল কাজকর্ম্মও তাঁহাকেই করিতে হইত। অহো, এই প্রকার দুঃখের কাহিনীসমূহ যে কতদূর হৃদয়-স্পর্শী তাহা সহৃদয় ব্যক্তি কেবলমাত্র অন্তরে অনুভব করিতে সক্ষম! লেখনী সে দুঃখের বার্ত্তা বর্ণন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম!

এইরূপ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া দিবারাত্র শারীরিক ও মানসিক গুরুতর পরিশ্রম করিয়া যে বালক আত্মনির্ভরতা ও প্রতিভাবলে জীবনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে প্রাণপণ যত্ন করে, বিধাতা সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার যথাযোগ্য পুরস্কার বিধানে কখনও কি বিমুখ হইতে পারেন? ঈশ্বরচন্দ্র যে দয়ার প্রতিমূর্ত্তি-রূপে উত্তর কালে সংসারে দেদীপ্যমান হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই অসাধ্য সাধনের প্রথম বীজ বিদ্যালয়ে বাল্যসহচরনিকরের

পরিচর্য্যার মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পিতা দরিদ্র, নিজেও সর্ব্বদা উদরপূর্ণ আহার পাইতেন না, অথচ বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পাইতেন সময়ে সময়ে তাহারও কিছু কিছু অপর সহাধ্যায়িগণের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন। কাহারও পীড়া হইয়াছে শুনিবা মাত্র চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন। স্বয়ং চরকাকাটা সূতায় প্রস্তুত মোটা চটের মত কাপড় পরিয়া নিজের অর্থ দ্বারা অন্যান্য দরিদ্র বালকগণের জন্য অপেক্ষাকৃত ভদ্রতর পরিধেয় ক্রয় করিয়া দিতেন। বালকের কথা দূরে থাকুক্—পরিণতবয়স্ক সুপ্রবীণ ব্যক্তির মধ্যেই বা কয়জন কোথায় আজ কাল এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতার অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত জনসমাজে দেখাইতে পারেন?

বাঙ্গালীর সৌভাগ্য—"বিদ্যাসাগর" বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর কথা দূরে থাকুক্—সমস্ত সভ্যজগন্মণ্ডলীর ইতিবৃত্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও এরূপ দরিদ্র বালকের এই প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধার ভিতরে আত্মোন্নতিসাধনের এতাদৃশ অত্যুজ্জ্বল অনুপম দৃষ্টান্ত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। একান্ত বিরল—নিতান্ত দুর্লভ!

এই প্রকার অপ্রতিহত অধ্যবসায়ে পাঁচ বৎসর কাল গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয়ের নিকট ক্রমে ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ সমাপন করিয়া সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলে, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার মনন করিলেন। ইতিমধ্যে অবসরক্রমে জন্মভূমি বীরসিংহে গিয়া তথায় কোন শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্রের শ্লোক রচনা করিলে ও তদুপলক্ষে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে ব্যাকরণ ও সাহিত্যের

বিচারে এই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক আপনার বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিলে, তাঁহার পাণ্ডিত্যযশঃসৌরভ জীবনের সেই প্রভাতকালেই দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতে লাগিল। এই সময়েই বাটীতে অবস্থান কালে ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের—'দিনময়ী' নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

বিবাহান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পঞ্চদশ-বর্ষবয়ঃক্রমকালে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অলঙ্কার-শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন; এক বৎসরের মধ্যেই সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি আলঙ্কারিক গ্রন্থনিচয় পড়িয়া ফেলিলেন। অলঙ্কার পাঠ সমাপ্ত হইলে তৎকালে ছাত্রগণ ক্রমে ন্যায়, বেদান্ত ও স্মৃতি শাস্ত্রত্রয় অধ্যয়ন করিত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাহা করিলেন না। বলিতে পারা যায় না কি কারণে—বোধ হয় দরিদ্র পিতা মাতার দারিদ্র্যবিমোচনমানসে, ধনপিপাসু হইয়াই—তিনি অলঙ্কার পড়িতে পড়িতেই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে 'ল কমিটী' পরীক্ষা দিবার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ছয়মাসকাল মধ্যে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রমসহকারে সেই দুর্ব্বিগাহ গ্রন্থ সমুদায় আয়ত্ত করিয়া, পরীক্ষায় সন্তোষজনকরূপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং লোকসমাজে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, মেধাবিতা ও প্রতিভা-শালিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু 'ল কমিটী' পাশ করিয়াও তিনি শেষে বিশেষসুযোগ সত্ত্বেও "জজপণ্ডিতের" কার্য্য করিতে যান নাই।

অতঃপর ঊনবিংশবর্ষবয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তশ্রেণীতে পড়িতে মনঃস্থ করিলেন। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় এই সময়ে

বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি নব্যশিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রের অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য মেধাশক্তি সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। এই শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের সাংসারিক কোন ঘটনা দ্বারা কোমলমতি ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরে তদানীন্তন সমাজের পরিসংস্কারবীজ রোপিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে তাহার সমালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইবে যে এই শৈশবকালেই ঈশ্বরচন্দ্রের কোমল মনে নানা প্রকার কঠিন কঠিন সামাজিক প্রশ্ন ও নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যাবলীর সংকল্প স্বতঃই আসিয়া স্থান পাইয়াছিল।

বেদান্ত অধ্যয়নের পর তিনি ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এই সময়েই পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ও রচনাবিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া প্রায় ২০০৲ দুই শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ন্যায় ও স্মৃতিপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুই মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ৮০৲ টাকা উপার্জ্জন পূর্ব্বক পিতৃভক্ত ঈশ্বরপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র তদ্দারা পিতৃদেবকে গয়াতীর্থে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তীর্থ হইতে পুনরাগমন করিবার পূর্ব্বেই ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন শাস্ত্র ও রচনা প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া পুনরায় প্রায় ২৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাইলেন।

এইরূপে আরও কিছুদিন জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া একবিংশতিবৎসরবয়ঃক্রমকালে তিনি আপনার অনন্যসাধারণ অত্যুজ্জ্বল ছাত্রজীবন সমাপন করিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের উদ্‌যাপন হইল। তাঁহার অধ্যাপকমণ্ডলী জানিলেন

যে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ঈশ্বরচন্দ্র "বিদ্যার সাগর" সুখে অতিক্রম করিয়াছেন; সুতরাং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" এই উপাধি প্রদান করিলেন।

অধ্যাপক ভাল মন্দ সকল ছাত্রকেই সমভাবে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন; তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানবিষয়ে কাহারও শক্তি উৎপাদন বা অপহরণ করিতে পারেন না। শিষ্যের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই জ্ঞানের প্রধান কারণ। সূর্য্যরশ্মি মণিসংস্পর্শে, জলে কিংবা দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে; মৃৎপিণ্ডে বা পাষাণে প্রতিফলিত হয় না; সেইরূপ উপদেশও সচ্চিত্তেই দীপ্তি পায়, কলুষিত মনে বিকাশিত হয় না। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের উর্ব্বরহৃদয়-ক্ষেত্রে যে সমুদায় জ্ঞানবীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা অচিরাৎ তাঁহার যত্ন, চেষ্টা ও সশ্রম অধ্যবসায়ের অনুসেচনে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া, কালে সুমহান্ জ্ঞানতরুরূপে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার অধ্যাপকমণ্ডলীও তাঁহার ন্যায় অনন্যদুর্লভ ধীশক্তি-সম্পন্ন শিষ্যের শিক্ষকপদবাচ্য হইয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মানুষের জীবনের চারি অবস্থার জন্য চারিটী ভিন্নভিন্ন ব্রত পালনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ তাহাই চারি আশ্রম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যথা:—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি। এই চারিটীর প্রথমে শাস্ত্ররীতিপালন ও শাস্ত্রের উপাসনা, দ্বিতীয়ে গৃহস্থের ধর্ম্মকর্ম্ম সংরক্ষণ; তৃতীয়ে একান্ততঃ ধর্ম্মোপার্জ্জন এবং চতুর্থে সংসারো-পরমে সন্ন্যাস।

অলৌকিকজ্ঞানশালী আফলোদয়কর্ম্মা 'বিদ্যাসাগর' মহাশয় এই ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিয়াই ছাত্রজীবন উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। অস্মদ্দেশের যে মহাপুরুষের বিয়োগে সর্ব্বত্র সমভাবে শোকের উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়াছিল—উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া সমস্বরে যাঁহার লোকোত্তর চরিতের গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছিল—এই ব্রহ্মচর্য্যাতেই তাঁহার অসামান্য গুণরাশির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাতে সৌভাগ্যগর্ব্বের বিকাশ ছিলনা, পাণ্ডিত্যাভিমানের উৎকট ছায়া ছিলনা, বা ভোগলালসার আবেগ ছিলনা। তিনি যেরূপ কষ্টসহিষ্ণু, বিলাস-বিদ্বেষী ও নিষ্ঠাবান্, সেইরূপ তেজস্বিতাসম্পন্ন ও প্রশান্ত-স্বভাব ছিলেন। তাঁহার জীবন প্রকৃত ব্রহ্মচারীর ন্যায় পরার্থ-পরতাময় ছিল। তিনি নিরতিশয় দরিদ্রভাবে যে কঠোর ব্রতের পালন করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রহ্মচর্য্যাই তাঁহাকে অলোক-সামান্য মহাপুরুষের মহিমান্বিত সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছে। তিনি দরিদ্রের জন্য দরিদ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, চির-জীবন দরিদ্রভাবে দরিদ্র পালন করিয়াই অনন্তপদে বিলীন হইয়াছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে পবিত্র বহ্নিশিখার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রখর দীপ্তি রাজাধিরাজ সম্রাটকেও হীনপ্রভ করিয়াছে। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নের সহিত বীরোচিত সংগ্রাম সহকারে ন্যায়নিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া অধ্যয়নে এতাদৃশ অনুরাগ-প্রদর্শন বঙ্গের প্রত্যেক ছাত্রের অনুকরণীয়। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ, যদি তোমরা বঙ্গবাসী বলিয়া পরিচিত হইতে চাও তবে ঈশ্বর-চন্দ্রের অনুকরণ করিয়া জীবন সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হইও।

ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এতদ্দেশে

অন্ধকারে সুষুপ্তির শান্তিময় ক্রোড়ে শয়ান লোকমণ্ডলী সহসা বন্যার জলে ভাসিয়া গেলে যেরূপ এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অস্মদ্দেশে ইংরেজীশিক্ষার প্রবল বন্যাপ্রবাহেও ঠিক তদনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা-স্রোতঃ বিদ্যুতের ন্যায় তীব্রবেগে চারিদিক্ চমকিত করিতে লাগিল; নবালোকে নবসম্প্রদায় দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তখন একদিকে অন্ধবিশ্বাসের অধীন হইয়া আপনার ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে লোক অলসভাবে দিনযাপন করিতেছিল, আর একদিকে নূতন ভাব ও নূতন উদ্যমের খরস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া সে সময়ের বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীকে কোথায় কোন অজ্ঞাত পথে লইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু নব্য 'বিদ্যাসাগর' মহাশয় বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়াই দেখিলেন—এক পার্শ্বে আবর্জ্জনাপূর্ণ জঙ্গলময় বনভূমি বহুরত্নের আকর হইয়াও অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সুদৃঢ় নিগড়ে নিসন্দিত, অপর-পার্শ্বে বিচিত্রদৃশ্য তারকাবলীপ্রতিবিম্বিত সলীলসলিলোচ্ছ্বাস-পূর্ণ বারিধিবক্ষঃ সুপ্রসারিত হইয়া তাঁহার নয়নমনঃ আকৃষ্ট করিতেছে; কিন্তু কত ভীষণকায় তিমি ও মকর সেই জলতলে লুক্কায়িত রহিয়াছে! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই উভয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দিব্যনেত্রে তাঁহার ভাবি-সঙ্কল্প-সকলের পথ দেখিতে পাইলেন; তাঁহার মানসনেত্র তাঁহাকে এই উভয়বিধ বাধাবিঘ্নের মধ্যে সর্ব্বদা সুপথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল; তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভাবের সংমিশ্রণে তাঁহার নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তিনি প্রাচ্য কুসংস্কার ও

বীরপুরুষের উপযোগিপথে, দিনদিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার সংযোগে যে কি মহামূল্য সম্পদের অধিকারী হইতে পারা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি উভয়শিক্ষার মন্দভাগ বর্জ্জনপূর্ব্বক, রত্নোত্তলন-দ্বারা, তাঁহার জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান সময়ের জীবনসমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

একদিকে এই নবালোকের নবোন্মেষে সমস্তবঙ্গবাসী উন্মেষিত হইতে লাগিল, অপরদিকে নব্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রের অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তিমন্দিরে প্রবিষ্ট হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের যে বিভাগে ঘটনার অত্যাশ্চর্য্য-বৈচিত্র—ত্যাগস্বীকারের অভাবনীয় দৃষ্টান্ত—লোক সেবার অক্ষয় কীর্ত্তি ও দেবদুর্ল্লভপ্রেমের ঘনবর্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছে—সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও নির্ভীকতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে—আমরা এখন তাঁহার জীবনচরিতের সেই দিকেই অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছি। এই অংশেই বাঙ্গালী জীবনের অমূল্য রত্ন সকল লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে ইদানীন্তন মৃতকল্প বাঙ্গালীজীবনের মৃতসঞ্জীবনী অমৃতকণা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

—:•:•:•:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(যৌবনে)

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে পাঠপরিসমাপ্তির সহিত "উপাধি" প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল মহোদয়ের অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে প্রথমতঃ স্থায়িরূপে চাকুরী আরম্ভ করিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগত সিবিলিয়ানগণ এই খানে দেশীয়ভাষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এদেশে 'জজ' 'মাজিষ্ট্রেট' প্রভৃতির পদে নিযুক্ত হইতেন। উত্তীর্ণ না হইলে বিফলমনোরথ হইয়া আবার সেই 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়া স্বদেশের শান্তিময় ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় লইতেন। এই পরীক্ষার সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল; এবং তিনি নানা প্রকার বিপরীত ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও— "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা" এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরোচিতভাবে নিরপেক্ষতার সহিত কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি এই ৫০৲ টাকার চাকুরী করিতে আরম্ভ করিয়াই প্রথমতঃ পিতার বহুদিনের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য, তাঁহাকে ২০৲ টাকা বেতনের ক্লেশকর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া নিজ বেতন হইতে তাঁহাকে মাসে মাসে ২০৲ টাকা পৃথক্ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ঐ ঘটনাই তাঁহার ঐকান্তিকী পিতৃ-ভক্তির প্রণোদন করিতেছে।

করিবার উপযোগিতা অনুভব করিয়া তাহা শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তৎকালে বঙ্গের চিরস্মরণীয় অনেকানেক সুহৃদ্-বর্গের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হওয়ায় তদ্বিষয়ে তাঁহা-দিগের নিকট হইতেও যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী করিবার সময়েই এক দিন ভারতের বড় লাট হার্ডিঞ্জ মহোদয় বিদ্যালয়পরিদর্শনমানসে পদার্পণ করিয়া হৃদয়গ্রাহী প্রাজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাদর-সম্ভাষণে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাৎকালিক দেশীয় বিদ্যাচর্চ্চার শোচনীয় অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিলে, বড়লাট বাহাদুর, তাঁহার ইচ্ছা ও উপদেশ অনুসারে তাঁহারই উপর তত্ত্বাবধারণের ভার বিন্যস্ত করিয়া, দেশের সর্ব্বত্র শতাধিকের উপর "আদর্শ" বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার আদেশ ও তৎসমুদায়ের অধ্যাপনার জন্য সংস্কৃত কলেজে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে নিযুক্ত করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। এই প্রকারে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক অস্মদ্দেশের বাঙ্গালা শিক্ষার প্রথম সূচনা হইতে লাগিল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে "হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়" নামে এই সময়ের প্রবর্ত্তিত অনেক বাঙ্গালা বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়।

কিছুকাল পরে সংস্কৃত কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদ পরিশূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। কিন্তু তিনি তৎকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ, তাঁহার চিরসুহৃদ্ বিদ্যোৎসাহী মার্শেল সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজে ময়েট সাহেবের নিকট ৯০৲ টাকা বেতন পাইয়াও যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। জ্ঞানলাভের অনুরোধে স্বার্থত্যাগের এই

একটী আলোকসামান্য উদাহরণ। পরন্তু শেষে তিনি মরেট সাহেবের নিতান্ত আগ্রহাতিশয় অতিক্রম করিতে না পারিয়া, ঐ পদের যথাযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সেই খ্যাতনামা অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ—বাচস্পত্য নামক সুবৃহদভিধান প্রণয়নে যাঁহার নাম অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি-মন্দিরের দ্বারদেশে খোদিত রহিয়াছে—যাঁহার সুযোগ্য বংশধর এখনও কলিকাতা রাজধানীতে থাকিয়া পিতার জ্ঞান-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন—কোবিদকুলপতি, সেই স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করা ঈশ্বরচন্দ্রের আন্তরিক অভিমত ছিল। কিন্তু তিনি তৎকালে কলিকাতা রাজধানী হইতে ৩০ ক্রোশ উত্তরে কালনায় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। কথা হইল শনিবার, লোক নিযুক্ত হইবে সোমবার। কি করিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অবশেষে শনিবার রজনীযোগেই কালনাভিমুখে পদব্রজে রওয়ানা হইয়া রবিবার মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে পরিতপ্ত হইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের গৃহে গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতার অভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরদুঃখকাতর প্রশান্ত-হৃদয় নির্ব্বাত সুবিমল সরোবরের অনিলোড়িত বক্ষের ন্যায়, নিয়ত শান্তির সুস্নিগ্ধমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিত; কিন্তু পরদুঃখের তৃণকণা সেই শান্তস্বভাবসম্পন্ন হৃদয়জলধিজীবনে বিনিক্ষিপ্ত হইলে, তাহাতেই উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার হৃদয় যেমন অক্ষুণ্ণ প্রীতির প্রস্রবণরূপে প্রতীয়মান হইত, তাঁহার মনের শক্তি এবং সাহসও তদনুরূপ প্রবল ছিল। এমন কোন কর্ত্তব্য ছিল না, যে তিনি তাহা করিতে ভীত বা পশ্চাৎপদ হইতেন। বোধ হয় কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বস্বান্ত

হইতে, এমন কি, আত্মবলি দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ হৃদয় ও মনের অনুরূপ বলশালী দেহও তাঁহার ছিল। তাঁহার মানসিক সংকল্প, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের প্রীতিধারা প্রাপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হইলে, তাহা যত বড় দুরূহ কার্য্যোদ্দেশেই প্রযুক্ত হউক না কেন, তাঁহার দেহ তাহা সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য ধারণ করিত। এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ লোকবিরল পরোপকারসাধন এই অধঃপাতিত বঙ্গদেশে কেবলমাত্র সদন্তঃকরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। প্রায় দ্বিগুণ ধনোপার্জ্জনের প্রলোভন পাইয়াও তাহা গ্রহণ না করিয়া থাকা, এবং সেই কর্ম্ম অপর একজন ব্যক্তিকে দিবার প্রস্তাব করা, তদন্তে দিবা রাত্রি পথ চলিয়া ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ব্যক্তিকে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া,—সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এই একটী ঘটনাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনের উচ্চতার ও হৃদয়ের প্রশস্ততার পূর্ণ পরিচায়ক।

ইতঃপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃভক্তির একটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। মাতৃভক্তির অন্যতম একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলেই তাঁহার উল্লিখিত অমানুষিক গুণের আরও বিকাশ পাইবে। ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যালয়ে যখন তাঁহার সৌভাগ্য-গৌরব-রবি পূর্ণপ্রদীপ্ত, তখন তিনি কোন কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহোপলক্ষে জননীকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বাড়ী যাইবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশপূর্ব্বক ময়েট সাহেবের নিকট ছুটী প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হইলে, জননীর আদেশ প্রতিপালিত না হইলে তিনি ক্ষুণ্ণমনাঃ হইবেন, এই জানিয়া অগত্যা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে বাটী রওয়ানা হইতে কৃত-

নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব মাতৃভক্তির নিরুপম আগ্রহ ও স্বর্গীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বিদায় দিলে তখন তিনি বাটী রওয়ানা হইলেন। কিন্তু হায়! সমস্ত পথ চলিয়া গিয়া পরদিন দিবাশেষে, সময়ের অল্পতানিবন্ধন পার হইবার সুযোগ অভাবে, দারুণ দামোদর নদের প্রবলতরঙ্গালোড়িত বক্ষে তিনি আপনার কষ্ট-সহনশীল কার্য্যক্ষম গা ঢালিয়া দিয়া পার হইলেন। যে ভীষণ দামোদর নদের বীচিবিক্ষোভে সামান্য তৃণগাছ পড়িলেও নিমেষ-মধ্যে শত শত হাত দূরে নীত হইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে উত্তাল তরঙ্গমালার অনন্ত গর্ভে নিহিত হইয়া যায়, সাহসী বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতৃভক্তির অপূর্ব্ব প্রসাদেই প্রসাদময়শরীরে সেই দামোদর নদ পার হইয়া সিক্তবস্ত্রকলেবরে রজনীতে জননীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন! অহো কি অপূর্ব্ব সুরম্য দৃশ্য! ভক্তির কি মোহিনী শক্তি! মাতাপুত্রের কি অনুবন্ধি হৃদয়া-কর্ষণ! দেখ বঙ্গের—বঙ্গের কেন, সমস্ত সভ্যজগন্মণ্ডলীর—উচ্ছৃঙ্খল যুবকমণ্ডলী একবার চাহিয়া দেখ, দেখিয়া নয়নমনের সার্থকতা সম্পাদন কর, প্রত্যক্ষ দেবদেবীস্বরূপা পিতামাতার ভক্তিপূজার একমাত্র আয়োজন—কর্ত্তব্য জ্ঞান ও যথাযথ আন্তরিক প্রবৃত্তি। এরূপ অকৃত্রিম ভক্তির স্বর্গীয় চিত্র ও এরূপ পিতৃমাতৃপূজার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত পৌরাণিক দেবদুর্লভ আখ্যায়িকাবলীতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, অদূর-দর্শী বাঙ্গালী হয়তঃ এরূপ ঘটনাকে বাতুলতা বলিয়া মনে করে! কিন্তু হায়, পিতামাতার প্রতি হীনভক্তি হইয়াই এই জাতি জগতে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে! তাই বলি আজ সকলে মিলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া পিতৃমাতৃপূজা শিক্ষাপূর্ব্বক জাতীয় উন্নতি মার্গে পদার্পণ করিবার পথ দেখ।

ঐ দেখ তোমার নয়নপথেই দেশের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের মহিমান্বিত বিচারাসনে সমাসীন হইয়াও—মূর্ত্তিমান্ হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে—আরও এক জ্বলন্তজীবন্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় রবার্ট কষ্ট নামে কোনও এক সিবিলিয়ান মহোদয়কে মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার নাম ও গুণগ্রাম সংবলিত দুইটী শ্লোক রচনা করিয়া দিয়া অত্যদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় প্রদান করিলে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া ২০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। আত্মত্যাগী ঈশ্বরচন্দ্র সেই টাকা কলেজের পারিতোষিক ফণ্ডেই প্রত্যর্পণ করিয়া আপনার পরার্থপরতা দেখাইলেন। এই কষ্টমহোদয় উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আরও নানাবিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইয়া লইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন ও তাদৃশ অপরাপরসূত্রেও তিনি মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পুরস্কার পাইয়া তাহা সদন্তঃকরণে পরার্থে ব্যয় পূর্ব্বক বদান্যতার দুরারোহ দ্বারদেশে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ভগবান্ তাঁহাকে সেই অনুকল্পের অনুযায়ী অবলম্বনও প্রদান করিলেন। ইতোমধ্যে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ পরিশূন্য হইলে ময়েট ও মার্শেল সাহেবদ্বয়ের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে তিনিই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তিনি সদাশয় মার্শেল সাহেবকে বলিয়া গেলেন—"যদি সেখানে কাজকর্ম্মের মতান্তর হয় কিম্বা কোনও প্রকার কথান্তর ঘটে, তাহা হইলে আমি অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া চাকুরী করিতে পারিবনা; সেরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিলে আমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে"; মার্শেল

ঘটিয়াছিল। এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দিয়া আপনার সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পরীক্ষামানসে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে ৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে প্রবিষ্ট হইলেন। আমরা আজ কাল যে সংস্কৃত কলেজ দেখিতে পাইতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারি-সম্পাদকত্বের পূর্ব্বে এ সংস্কৃত কলেজ এরূপ ছিল না। কুনিয়ম ও অব্যবস্থার অপ্রতিবিধেয় প্রশ্রয়দানে, উদীয়মান সংস্কৃতকলেজ উন্নতিশীল হইয়াও কয়েক দিনের জন্য ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের ন্যায় নিস্তেজ ও হীনপ্রভ হইয়াছিল। তাঁহার পৌরুষপাবকপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাত-পতঙ্গ-সঙ্ঘ পুড়িয়া গেল। অধ্যাপকমণ্ডলীর স্বেচ্ছাচারিতার স্থানে বিধিব্যবস্থা দেখা যাইতে লাগিল। তিনি দিন দিন নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা করিয়া কলেজের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী ও বিধিব্যবস্থা অর্দ্ধশতাব্দীর পরেও অদ্যাপি তাঁহার সুগভীর প্রতিভার ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও, সেই কাজে গেলে সুচিরবাঞ্ছিত কলেজের আভ্যন্তরীণ উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইবেন না বলিয়াই তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে যখন ধীরমতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চতুর্থ সহোদরের মর্ম্মভেদিনী বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন সংস্কৃত কলেজের কার্য্যপ্রণালী লইয়া সম্পাদক বাবু রসময়

ব্যতিক্রম ঘটে দেখিয়া পুরুষপ্রকৃতি স্বাধীনচেতাঃ ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এই খানেই তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগের আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য ও কারণ বিবেচনা করিলে, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার উন্নত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে ভয়ে মার্শেল সাহেবকে ছাড়িতে চান নাই, কার্য্যতঃ সেই ভয়েই আবার তাঁহাকে মার্শেল সাহেবের নিকট প্রত্যাবৃত হইতে হইল। এই কর্ম্মত্যাগের পর ১৮৪৯খৃঃ শেষভাগপর্য্যন্ত কোথাও কোনও কাজকর্ম্ম করিলেন না। এদিকে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে পুনঃ প্রবিষ্ট করাইতে চেষ্টায় বিরত হইলেন না। কিন্তু তিনি সহজে তথায় যাইতে চাহিলেন না। অবশেষে মার্শেল সাহেবের নিরতিশয় আকিঞ্চন ও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে ৮০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "প্রধান লেখকের" পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ঐ পদে অধিক দিন অবস্থিতি করিতে হয় নাই। দিনপূর্ব্বভাগে নীহার-নিমগ্ন তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যাহ্নে স্বতঃই বিকাশমান হইয়া পড়িল। ১৮৫০খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদচ্যুতির পর পুনরায় সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন; এবং ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিদ্বন্দী কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত কর্ম্মত্যাগ করেন। সুতরাং পরবর্ত্তি জানুয়ারী মাসে (১৮৫১খ্রীঃ) তিনি সংস্কৃত কলেজের 'প্রিন্‌সিপাল' অর্থাৎ "সর্ব্বময় অধ্যক্ষের" পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বের সঙ্গে সঙ্গেই "সম্পাদক" ও "সহকারী সম্পাদক" এতদুভয়ের পরিবর্ত্তে ১৫০৲ টাকা বেতনে নূতন অধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইল। তিনিই এই সর্ব্বাঙ্গীণসমুন্নতিসাধনশীলসর্ব্বোচ্চপদে

নিযুক্ত হইয়া কলেজের উন্নতি সাধনকল্পে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন; সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলেন—কিরূপ উপায়ের অবলম্বন করিলে শিক্ষা সুপ্রণালীসঙ্গত ও সহজ হইবে। দেবভাষা সংস্কৃতের প্রবেশদ্বার, ব্যাকরণরূপ সুদৃঢ় লৌহময় কবাটদ্বারা সুরক্ষিত। এই দ্বার অতিক্রম করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের সুরম্য-কাননে পরিভ্রমণ করিতে ও কাব্যের সুমন্দমলয়ানিলসন্দোলিত সুরভিসম্ভার সম্ভোগ করিতে, অতি অল্প লোকই সক্ষম। অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাশালী বিদ্যাসাগর মহাশয় উপক্রমণিকা ও পরবর্ত্তি ব্যাকরণগুলি প্রণয়ন করিয়া পাণিনি ও বোপদেব ব্যাকরণ রচনা করিয়া যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি যে কেবল সেই অমরত্বই লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, বাঙ্গালীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠুতর সুকৌশলসম্পন্ন সহজদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তি সময় হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি এত হৃদয়গ্রাহিনী ও চিত্তচমৎকারিণী হইতে লাগিল, যে ইংরাজ বাঙ্গালী সকলেই সমভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার কোমলতাময় অথচ বীরত্বব্যঞ্জক সেই মুখমণ্ডলে প্রতিভার পরাক্রম পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সেই সুমধুর লাবণ্যবতী মূর্ত্তি সন্দর্শনে একদিকে যেমন হার্ডিঞ্জ, ডালহৌসী, ক্যানিং ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরাজমণ্ডলী সম্মানসহকারে নতমস্তক হইতেন, অপরদিকে আবার দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বঙ্গীয় লক্ষপতি জমিদারগণ তাঁহার আত্মীয়তা ও সস্নেহদৃষ্টির অনুগত হইয়া চলিতে সুখানুভব করিতেন। কিন্তু নিরন্ন দরিদ্র নরনারীমণ্ডলীর সহিত তাঁহার এতদপেক্ষাও দৃঢ়তর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। যে

বহুসমাদরে সুখোপবিষ্ট—যে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে বহুসম্মানে গৃহীত ও সমাদৃত—যিনি পাইকপাড়া রাজভবনে পূজিত,—সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ই আবার দরিদ্রের পর্ণকুটীরে মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপার্শ্বে প্রাতঃসন্ধ্যা সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি মধুর চিন্তা! ভাবিতেও কি প্রাণে সাগর-তরঙ্গ-সদৃশ আনন্দোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হয় না?

অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কলেজের উন্নতিসম্পাদনোপযোগী এক রিপোর্ট লিখিয়া, ময়েট সাহেবের প্রসাদে, ১৫০৲ টাকার স্থলে ৩০০৲ তিনশত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। এই রিপোর্ট হইতেই বুঝা যায় যে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে বঙ্গভাষা প্রচলন করিবার জন্য নানাপ্রকার সদুপায় উদ্ভাবিত করিতেছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে "হার্ডিঞ্জ আদর্শ বিদ্যালয়" সংস্থাপনের জন্য তিনি যে প্রকার মনে প্রাণে লাগিয়াছিলেন সম্প্রতি এই রিপোর্টেও তিনি, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়ও তাহার শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্ম্যাল স্কুল স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ঐ সকল কার্য্যে পরিণত হইলে তিনি একাকীই তাহার কার্য্য পরিচালনার ভার পাইলেন। অধিকন্তু ১৮৫৫ খ্রীঃ তিনি মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়া এই চারি জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন ও পরিদর্শন করিবার জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে অতিরিক্ত ইনিস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইলেন। এখন তাঁহার মাসিক মোট বেতন হইল ৫০০৲ পাঁচশত টাকা। ৫০০৲ শত টাকার কথা শুনিলে, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া

আপাততঃ অধিক বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু তিনি নানাদিকে কত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, তাহা একবার চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নিতান্ত সুধীর এবং শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষেও অবিচলিত সাহস ও ধৈর্য্য, আত্মপ্রিয়তা ও পরার্থপরতা না দেখাইতে পারিলে, এইসকল কার্য্য সম্পাদন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তৎকালে অপর কোনও ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্য একাকী চালাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। অধীর চঞ্চল ব্যক্তি অল্পমাত্র কার্য্য আরম্ভ করিয়াই ব্যাকুল হইয়া পড়ে; কিছুতেই তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বৃহদ্ বৃহদ্ কার্য্য আরম্ভ করিয়াও নিরাকুলভাবে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কোন প্রকারেই স্বকীয় কর্ত্তব্যমার্গে বিচলিত হইলেন না। মনে প্রাণে উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরাধীনত্ব নির্ব্বাণের কিয়ৎ পূর্ব্বেও সেইরূপ তাঁহার কার্য্যকলাপ উন্নতির সমুন্নত সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল। সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর মনোমালিন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এত দিন তিনি গবর্ণমেণ্টের হইয়া সকলের উন্নতির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াই কাল হরণ করিতেছিলেন; এখন আবার সকলের হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট উন্নতির উদ্ভাবন পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়া নিজের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ও শিক্ষা সমাজের সর্ব্বময় সম্পাদক ডাক্তার ময়েট সাহেব কিছু দিনের জন্য বিলাত

যাত্রা করেন। খ্যাতনামা হৃদয়বান্ হ্যালিডে সাহেবও সেই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষা বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তনের বিধান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শিক্ষাসমিতির 'অধ্যক্ষতার' পরিবর্ত্তে 'সাধারণ শিক্ষা বিভাগের পরিচালক' এই পদের সৃষ্টি করিয়া ডাক্তার ময়েট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে তিনি, ডব্লিউ গর্ডন ইয়ং নামে কোন যুবক সিবিলিয়ানকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া শিক্ষা বিভাগের সমস্ত ভার তাঁহার উপরে অর্পণ করিলেন। পরিণামদর্শী বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু তাঁহার স্বভাবসুলভ নির্ভীকতার সহিত ছোটলাট বাহাদুর-কে ঐ পদে কোন যোগ্যতর লোক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; যদিও তখন বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে একথা ওকথা বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া নিবৃত্ত করিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে, তিনি যে আশঙ্কা করিয়া ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন, অতি সত্বরই সে আশঙ্কার বীজ অঙ্কুরিত হইল।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিধায়কমন্তব্যে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতের শিক্ষাবিভাগের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন; ১৮৩৫অব্দে মহামতি মেকলে ও বড়লাট বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির অনুসরণে তৎকালে দেশীয় মন্ত্রিসভাও তদনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তদনুসারে তত্ত্বাব-ধারণের ভার প্রাপ্ত হইয়া কয়েক জিলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিলাতীমন্তব্যসম্বন্ধে অচিরেই তাঁহার সহিত সম্পাদক ইয়ং সাহেবের সহিত মতান্তর ঘটিয়া উঠিল। সাহেব অপরাপর ইনিস্পেক্টারগণের পরামর্শে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

হ্যালিডে সাহেব এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বিলাত হইতে পুনরায় সংবাদ আনাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যেরই অনুমোদন করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষ কিছুকাল ছোটলাটের সহায়তায় আত্মপক্ষ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল সময়েই ঈশ্বরচন্দ্রের সুরুচি ও সুবিচার সঙ্গত মীমাংসারই জয়লাভ হইতে লাগিল।

এই সময়ে নানাকারণে সংস্কৃতকলেজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার গোলযোগ হইয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক যত্নে তাহার মূলোৎপাটন স্থগিত রহিল বটে, কিন্তু সকলবিধ সুখ ও সুবিধা চিরদিনের মত তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনেকানেক বৃত্তিরও উচ্ছেদসাধন হইল।

এই সময়েই সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ঘর লইয়া ইয়ং সাহেবের সহিত ঘোরতর মনোমালিন্য ঘটিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভাময় সুচতুর কার্য্যাবলীতে ইয়ং সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বিস্মিত ও রোষান্বিত হইলেন। ক্রমে বৈরবীজ অঙ্কুরিত হইল। রেশারেশি আরও বদ্ধমূল হইল। অদূরদর্শী ইয়ং সাহেব হীনমতি আত্মীয়গণের উপদেশে পরিচালিত হইয়া সপ্তরথিসহযোগে অভিমন্যু বধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সময়েই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বর্ত্তমান সমুন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। পরীক্ষা সমিতি সংগঠিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সমধিক যত্নপরায়ণ হইয়া আপনার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন। ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পরিবর্ত্তে সিভিলিয়ানগণের পরীক্ষাগ্রহণ জন্য "সেণ্ট্রাল কমিটী"

নামে এক অভিনব "কমিটী" স্থাপিত হয়। বলাবাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই কমিটীর সর্ব্বময় ভার প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু হায়, এদিকে দুর্ব্বুদ্ধিদুষ্ট ইয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড়ই লাঞ্ছিত ও সরকারী কার্য্যে বড়ই গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাধীনচিত্ত তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। হ্যালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একান্ত আত্মীয়তা ছিল। বোধ হয়, তদনুরূপ—রাজা প্রজায়—ইংরাজ বাঙ্গালীতে—প্রভু-ভৃত্যে—আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই, হইবেও না। তিনি অনেক বিষয়ে অনেকবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষালম্বন করিয়াও তাঁহাকে ইয়ং সাহেবের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও নব্য ইয়ং এর জেদের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের চলা অসম্ভব বিবেচনায় তাহা পারিয়া উঠিলেন না। ক্রমে তাঁহার প্রধূমিত বৈরানলে ইন্ধন সংযোগ হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার বিদ্যালয়ের রিপোর্ট প্রদান করিলে ইয়ং তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া বেশ করিয়া সুন্দরকরণান্তর পুনঃ প্রদান করিতে আদেশ করেন। বিদ্যাসাগর কিছুতেই তাহার এক বর্ণও পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না; পরিশেষে অত্যধিক পীড়াপীড়ি করায় তিনি কর্ম্মত্যাগের অভিপ্রায় জানাইলেন। এক বৎসর কাল ক্রমে তজ্জন্য লেখালেখি হইতে লাগিল। হ্যালিডে ও অপরাপর রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছাড়িবেন না, তিনিও থাকিবেন না। তিনি হ্যালিডে ও ইয়ং উভয়কেই আপন মত জানাইলেন। একদিকে ইয়ং সাহেবকে ১৮৫৮ অব্দে ৫ই আগষ্ট তারিখে পত্রদ্বারা জানাইলেন "আমি

বেশ অনুভব করিতেছি যে, এই দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যের সম্পাদনে যেরূপ গভীর মনোযোগের প্রয়োজন আমার দ্বারা এক্ষণ আর তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই ; আমার এক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন। সাধারণের স্বার্থ এবং আমার নিজের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক শান্তি রক্ষা করিতে হইলে, বর্ত্তমান কার্য্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করা ভিন্ন আমি সে সুখলাভের উপায়ান্তর দেখি না। আমি স্থির করিয়াছি, আমার স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পুস্তকরচনা ও সঙ্কলনদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত থাকিব। স্বদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা প্রদান এবং জ্ঞান বিস্তারের সহিত, যদিও আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ চলিয়া যাইতেছে—তথাপি আমি জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র সময় সেই সুপবিত্র অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিব। এবং সেই ব্রত জীবনের শেষদিনে, আমার চিতাভস্মে উদ্‌যাপিত হইবে। আমার এই ভবিষ্যদ্ গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইবার যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ বিদ্যমান আছে তাহাদের মধ্যে ভবিষ্যদ্ উন্নতির আশার লোপ ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে আমার প্রতি আমার উপরিতন কর্ম্মচারীর ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাবই প্রধান কারণ।" অপরদিকে ইহার প্রায় এক মাস পরে মাননীয় হ্যালিডে সাহেবকে লিখিয়া জানাইলেন যে "আমি পূর্ণমনোযোগসহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ; আমার শরীর অসুস্থ বটে কিন্তু আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতে পারি না যে, শারীরিক অসুস্থতাই আমার কর্ম্মত্যাগের একমাত্র কারণ। যদি তাহাই সত্য হইত, তাহা হইলে আমার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দীর্ঘকালব্যাপী বিদায়

লইলেই পারিতাম। আমি ত আপনাকে বহুবার জানাইয়াছি যে বর্ত্তমান ব্যবস্থার অধীনে কর্ম্ম করা আমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর ও ক্লেশদায়ক হইয়াছে।" অবশেষে তিনি ১৮৫৮ খ্রীঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে চিরকালের মত কর্ম্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই ইহাতে সমধিক চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনাসকল আত্মীয় স্বজনগণের কল্পনার বিপরীত ফল প্রসব করিয়া, তাঁহার জীবনকে শত শত গুণে উজ্জ্বল করিয়াছে এবং তাঁহার অত্যদ্ভুত পরার্থপরতার গুণে স্বদেশের অশেষ কল্যাণকর সুলভ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি বড় আশা করিয়াই তাঁহার কর্ম্মত্যাগপত্রে স্পর্দ্ধাভরে লিখিয়াছিলেন— "আমি জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র সময় সেই সুপবিত্র অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিব; এবং সেই ব্রত, আমার জীবনের শেষ দিনে, আমার চিতাভস্মে উদ্‌যাপিত হইবে।" তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা যে সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছিল. তাঁহার রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তিনি যে বিজয়ী পাণ্ডবগণের ন্যায় সর্ব্বদা ভগবানের শুভদৃষ্টি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? তিনি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে উপেক্ষা করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সুতীব্রতাড়িতালোকসদৃশ সর্ব্বজগদ্বিমোহিনী প্রতিভার পরাক্রমে মানবমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে বিজয়ী হইয়া মানবকুলের মুকুট স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছেন! কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

চরিতমাধুরী উত্তরোত্তর আরও অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া মানবের মনস্তুষ্টি সাধন করিবে; এবং যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানবগণ অবনত-মস্তকে সেই গুণ রাশির সমক্ষে প্রণত থাকিবে।

বিপুলপরাক্রমশালিদেহবিশিষ্ট কুঞ্জরশ্রেষ্ঠ পিঞ্জরবদ্ধ হইলে যে দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়, গুণবান্ পুরুষের পরপদের সেবাকাঙ্ক্ষায় জীবন যাপন করিতে হইলেও তিনি তদপেক্ষা অধিকতর হীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পরানুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া চিরকাল পরাধীন-ভাবে দীনের ন্যায় দিন যাপন করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর পারিলেন না। তিনি সেরূপ ধাতুর নির্ম্মিত লোক ছিলেন না। পরের দাসত্ব তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি পরোপকারের জন্যই দীন ভারতে বিধাতৃ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া-ছিলেন; এবং চিরকাল পরোপকার ব্রত পালন করিয়াই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। নিয়ত দুঃখদারিদ্র্যে দুর্দ্দিনময় এই সংসারে তিনি আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি গুণে নিজের সুচারু চরিত্র ভাস্কর প্রকাশ করিয়া সুপবিত্র গৃহস্থাশ্রমের মাহাত্ম্য যথার্থই সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

যে কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন সে কালের কালধর্ম্ম সাধন করিবার নিমিত্তই তাঁহার মত একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। যখন কালস্রোতঃপরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয় তখন সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

—:•:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(বার্দ্ধক্যে)

এতদিন আমরা বিদ্যাসাগরমহাশয়কে লইয়া সংস্কৃত কলেজের রঙ্গশালায় খেলা করিতেছিলাম। কত অভাবনীয় অভিনব অভিনয় দেখাইলাম, কতবা বিস্ময়কর অভিনেতার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া হাসিলাম,—আবার কাঁদিলাম! কিন্তু হায়, সহসা আজ সেই সুরম্য রঙ্গমঞ্চের সুচিরবাঞ্ছনীয় যবনিকার পতন হইল! তিনি সংস্কৃত কলেজের দাসত্ব ছাড়িয়া সংস্কৃত ভাষার দাসত্বস্বীকার করিলেন। রাজসরকারে ৫০০৲ টাকা বেতন পাইবার পরিবর্ত্তে, অকাতরে অপরকে স্বোপার্জ্জিত ৫০০৲ পাঁচ-শত টাকার শতশত গুণ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীন হইয়াই সাহিত্য-সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। বঙ্গভাষার নূতনত্ব দেখাইয়া সংবাদ পত্রের প্রচারকল্পে পরমোন্নতিসাধনপূর্ব্বক জাতীয়-জীবনের অন্ধতমস বিদূরিত করিলেন—উপযুক্ত সাহায্যবলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তনা করিয়া বহুশ্রম ও ক্ষতিস্বীকার পূর্ব্বক বঙ্গীয়-ললনাগণের প্রাধান্য দেখাইতে লাগিলেন—সমাজবন্ধনে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া তাহার মনঃপ্রাণ গলিয়া গেল—তিনি কুসংস্কাররূপ কণ্টকাবৃত রাজপথ পরিষ্কার করিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রবলে তাহা সুগমকরণান্তর আপনার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন—সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের ফল

দেখাইতে লাগিলেন—দানশীলতায় ও পরসেবায়—দুর্ভিক্ষও পীড়াগ্রস্ত লোকের সাহায্য ও পরিচর্য্যায় সমাজের অগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইলেন—আপামর সাধারণ সকল জীবের প্রতিই নিরুপম স্বর্গীয় প্রেমের সমবর্ষণ দেখাইতে লাগিলেন। যেখানে যে উপায়ে সম্ভব আত্মীয়স্বজনকে স্বপ্রবর্ত্তিত উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া তাঁহার সৎকর্ম্মমালার সুরভি প্রসূনরাশি গ্রথিত হইলে, তিনি বিশ্ববিমোহিনী জগন্মাতার গলদেশে সেই শান্তিমালা সমর্পণ পূর্ব্বক, একদিকে সুদূর ইংলণ্ডবাসী রাজপুরুষগণের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া অপরদিকে দেশের সর্ব্বাগ্রগণ্য মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া অভাগা বাঙ্গালীর প্রাণে নিদারুণ দুর্ব্বিষহ বিষময় শোকশেল সম্বদ্ধ করিয়া সুচিরবাঞ্ছিত স্বর্গরাজ্যের সর্ব্বোচ্চসিংহাসনে গিয়া সমাসীন হইলেন।

তাঁহার সেই সুপবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত মানবের নয়নপথ হইতে তিরোহিত হইল! হায়, হতভাগ্য আমরা ইহজীবনের মত তৎসন্দর্শনে বঞ্চিত হইলাম! কিন্তু একমাত্র আশ্বাস, তাঁহার সেই অলৌকিক কার্য্যকলাপের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজও স্পষ্টভাবে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। এক্ষণে জীবনের আদর্শস্বরূপ সেই সকলের অনুসরণও ভবিষ্যন্নরনারীমণ্ডলীর শিক্ষাকল্পে সেই সকলের বিশুদ্ধ সমালোচনাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আমরা সংক্ষেপে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শজীবনে যদি আত্মোত্যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিয়া বাহির করা যায়, তবে সংস্কৃত-

কলেজের মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনের চাকুরী পরিত্যাগ করাই যে তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধানতম তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এই চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াই যে তিনি কিছুদিনের জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি নিজে কেন—বাঙ্গালী ও ইংরাজ ভদ্রলোকের মধ্যে সকলেই—এমন কি, তাঁহার চিরবৈরী ইয়ং পর্য্যন্তও সেই কারণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই সময়েই তদনীন্তন সুপ্রীমকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি মাননীয় স্যার জেম্‌স্ কল্‌ভিন মহোদয় তাঁহাকে আইন পরীক্ষা দিয়া ওকালতী করিবার পরামর্শ প্রদান করেন; কিন্তু সে বিষয়ে পূর্ব্বকালে তাঁহার সবিশেষ বর্দ্ধিত-রুচির পরিচয় পাওয়া গেলেও, এক্ষণে তাদৃশ অনুরাগ না থাকায় তিনি সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ইংরাজ ও ইংরাজী আইন তাঁহাকে হারাইলেন, বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাকে পাইলেন।

জোয়ারকালে সমুদ্রসন্নিহিত স্রোতস্বতীর স্রোতঃ পুরোদেশে শৈলসংঘর্ষণে যেমন প্রবলতর প্রবাহে প্রবাহিত হয়, আজকাল বঙ্গভাষাও সমালোচকের লেখনী স্তম্ভে প্রতিহত হইয়া তদপেক্ষা তীব্রতর তেজে ছুটিতেছে; কিন্তু এই প্রবল উচ্ছৃঙ্খল স্রোতঃ এককালে কোন প্রশান্ত জলধিজলের উচ্ছ্বাস হইতে উদ্বেলিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবশিষ্ট জীবনী ও লেখনী হইতেই আমরা তাহা দেখিয়া লইব।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। তাঁহারা উভয়েই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত

গণের সংঘর্ষণে বঙ্গভাষা প্রকৃতপ্রস্তাবে সংগঠিত হইয়া উঠে। একদিকে চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন, চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ—অপর দিকে শাক্ত কবিকুলচূড়ামণি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎপরেই বঙ্গের সুচিরপ্রসিদ্ধ অমর কবিদ্বয় কৃত্তিবাস ও কাশীরাম, ক্রমে রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিলেন। প্রতিকূল কালস্রোতে বাল্মীকি ও ব্যাসের নাম ভাসাইয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই কৃত্তিবাস ও কাশীরামকে পাইয়া বঙ্গসমাজ সন্তোষ লাভ করিলেন। ইহাঁদের পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এই দুই জনের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত কথক-ঠাকুর মহাশয়গণ, কবিগায়ক ও যাত্রাব্যবসায়িগণও অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালাসাহিত্য প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিতে-ছিলেন। বলাই বাহুল্য যে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল পদা-রচনা প্রণালীই প্রচলিত ছিল; গদ্য লেখা জনসাধারণের কিছু-মাত্র বিদিত ছিল না।

কিন্তু কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কোন্ মহাত্মার দ্বারা কি উপায়ে কোন্ কোন্ সদনুষ্ঠানের অবলম্বনে বঙ্গ ভাষার আধুনিক কলেবর পুষ্টি সম্পাদিত হইয়াছে—সহসা কি এক দৈব শক্তি লাভ করিয়া কিশোর কাল অতীত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গভাষা এত শক্তি ও সামর্থ্য, এত বিচিত্রতা ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া প্রবল বেগে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাই আমরা ক্রমে দেখাইতেছি।

ইতঃপূর্ব্বে ১৭৭৮ খ্রীঃ চার্লস্ উইলিকিন্স্ নামক এক জন ইংরাজ বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী এক প্রস্থ বাঙ্গলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ক্রমে তিনি পরবর্ত্তিকালে বঙ্গ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় উৎসাহদাতা হালহেড সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া—আজ আমরা যেই অনুষ্ঠানের সুফল সম্ভোগ করিতেছি—তাহারই বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ডকর্ণওয়ালীসের সংগৃহীত ও অনুমোদিত আইন সকল ফষ্টার নামক একজন ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হয়। ইহা হইতেই বঙ্গভাষার গদ্যগ্রন্থের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম আভাস পাওয়া যায়। যদিও গদ্যগ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে দেশের অনেক স্থলে লুক্কায়িত ভাবে সুরক্ষিত হইতেছিল, কিন্তু এই উদ্যমশীল ইংরাজের প্রথম উদ্যমেই ইহা সর্ব্বপ্রথমে সাধারণ্যে পরিব্যক্ত হয়। ইংরাজ এইরূপ উদ্যমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতার বলেই সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়া দেশে দেশে বীরবেশে বিচরণ করিতেছেন ও সর্ব্বত্র সকল মনোরথ হইয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন—আর আমরা বুঝিয়াও এই গুণ নিচয়ের অভাবেই মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছি। ইংরাজ আমাদিগের নিকট শিখিয়াই আমাদিগকে শিখাইতেছেন; কিন্তু হায়, আমরা শিখিয়াও শিখিতে পারিতেছি না!

অনেকের ধারণা রাজর্ষিকল্প রামমোহন রায় মহাশয়ই বাঙ্গালা গদ্যলেখার প্রথম পথপ্রদর্শক। বস্তুতঃ জনসমাজের হৃদয়ে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইবার প্রভূত কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু নৈহাটী নিবাসী, সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক—বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুজ্জ্বলরত্ন—বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম সেবক, লেখকপূজনীয় শ্রীযুক্ত

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনী প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নিশ্চয় জানা যায় যে বাঙ্গলা গদ্যলেখার লেখকবর রাজা রামমোহন রায় ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) এই দুই জনের মধ্যে প্রাচীনতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও, তিনি তাঁহাদের ঘরে হস্তলিখিত পৈতৃক "স্মৃতিকল্পদ্রুম" নামে যে গদ্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদপেক্ষা প্রাচীনতম গদ্যগ্রন্থ অদ্যাপি আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই। যখন উক্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রিমহাশয়দিগের বাটীতে আনীত হয়, তখন গৌরীশঙ্কর তথায় অধ্যয়ন করিতেন; সুতরাং তিনি যে তাহা হইতেই গদ্য রচনার আভাস পাইয়াছিলেন, এবং তদ্বারা সর্ব্বসুযোগসম্পন্ন রাজা রামমোহনের সহিত সুচতুরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অতএব গদ্যসাহিত্যে রাজারামমোহনের কি গৌরীশঙ্করের প্রাচীনতা লাভকরা সুদূরপরাহত। শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রাপ্তগ্রন্থই যে অদ্যপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাচীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে যে একখণ্ড পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাও নিতান্ত আধুনিক নহে। আরও কোথায় যে কিছু না আছে তাহাই বা কে বলিবে? সুতরাং কালক্রমে উক্তসিদ্ধান্তও যে ভ্রান্ত হইতে পারে তাহারও আর বিচিত্রতা নাই?

কিন্তু যে সুমধুর, সুললিত বঙ্গভাষা আজ বঙ্গবাসীর কর্ণকুহরে পীযূষ-সেচন করিতেছে, যে ভাষার প্রবল-শক্তি ও বহুলবিস্তৃতি দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আজ আনন্দিত, যাহার সশ্রীকতাসম্পাদনে বিপুলপ্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়া-

ছিলেন,—তাঁহার তুলিকাগ্রে যে ভাষা অনুপম সৌন্দর্য্যলাভ করিয়াছিল, যে ভাষার গাম্ভীর্য্যসম্ভূত গৌরববর্দ্ধনে পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রবীণ লেখক আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, আজ যাঁহার সেবায় বহুসংখ্যক সুসন্তান নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই মাতৃভাষার গঠনকার্য্যে, তাহার পারিপাট্যসাধনে, তাহার অবশদেহে প্রাণসঞ্চারের জন্য আমরা কাহার নিকট ঋণী? অবিরত বিন্দু বিন্দু নিজের শরীর-শোণিত পাত করিয়া বহু-চিন্তা ও বহু-পরিশ্রম-সহকারে নিজের কন্যানির্ব্বিশেষে কোন্ মহাত্মা ইহাকে লালন-পালন করিয়াছেন? ঐ শুন, সমগ্র বঙ্গবাসী সহর্ষে হস্তোত্তলন-পূর্ব্বক সমস্বরে বলিতেছেন, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সেই ব্যক্তি;—তাঁহারই মমতাময় শান্তিজলসংস্পর্শে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাণ পাইয়াছে; তিনিই মহর্ষি কণ্বের ন্যায় কন্যা শকুন্তলাকে লালনপালন করিয়াছিলেন; তিনিই মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি হইয়া বননিবাসিনী সীতাদেবীর অশ্রুবিমোচনপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছিলেন।

তাঁহার সেই যত্ন, সেই চেষ্টা ও সেই ত্যাগ-স্বীকারের একমাত্র বলেই তিনি এখন পরিচালিত হইতে লাগিলেন। বঙ্গভাষা অপূর্ব্ব রমণীয় ভাব ধারণ করিল; তাঁহার লেখনীস্রোতঃ প্রবল-বেগে বহিতে লাগিল। তিনি ৫০০৲ টাকার মমতা ছাড়িয়া দিয়া শত শত গুণ ৫০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কৃপাময়ী বীণাপাণির অনুগ্রহে তাঁহার আয় এত অধিক হইতে লাগিল, যে তাঁহার পূর্ব্বসঙ্কল্প সকল তাঁহার হৃদয়মধ্যে পরিশুষ্ক না হইয়া ক্রমশঃ সজীব হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সর্ব্বোপকারক্ষম গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সকলের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি-

তিনি সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০।৬০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানির ধারাবাহিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বেতাল পঞ্চবিংশতি—১৮৪৭, বাঙ্গালার ইতিহাস—১৮৪৮, জীবনচরিত—১৮৫০, বোধোদয়—১৮৫১, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ—১৮৫২, ঋজুপাঠ (তিন ভাগ)—১৮৫২, ব্যাকরণ-কৌমুদী (১ম)—১৮৫৩, ব্যাকরণ কৌমুদী (২য় ও ৩য়)—১৮৫৪, শকুন্তলা—১৮৫৫, বিধবা-বিবাহ (১)—১৮৫৬, বিধবা-বিবাহ (২)—১৮৫৬, বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য়)—১৮৫৬, কথামালা—১৮৫৬, সংস্কৃত সাহিত্য ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—১৮৫৬, চরিতাবলী—১৮৫৭, মহাভারতের উপক্রমণিকা—১৮৬০, সীতার বনবাস—১৮৬২, ব্যাকরণ-কৌমুদী (৪)—১৮৬২, আখ্যানমঞ্জরী (১)—১৮৬৪, আখ্যানমঞ্জরী (২)—১৮৬৮, আখ্যানমঞ্জরী (৩)—১৮৬৮, ভ্রান্তি বিলাস—১৮৭০, বহুবিবাহ—১৮৭১ ইত্যাদি।

কিন্তু এই স্থানে ইহা বলা আবশ্যক যে 'বাসুদেবচরিত' লইয়াই তিনি প্রথমে গ্রন্থক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় নাই।

বলা বাহুল্য ঐ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রচার ও উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া বঙ্গবাসীকে যে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর কদাপি পরিশোধ হইবে না।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অনেকানেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সাহায্যে ও ভারতের চিরসুহৃৎ প্রাতঃস্মরণীয় বেথুনসাহেবের উদ্যোগে মহানগরী কলিকাতায় বর্ত্তমানভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়। এতৎপূর্ব্বেও কিছু কিছু করিয়া তাহার প্রবর্ত্তনা হইতে-

ছিল ; স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর এইপক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। কালক্রমে যেপ্রকার উত্তরোত্তর উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষায় যে দেশের অপকার অপেক্ষা অধিকতর উপকার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কোমল কামিনীগণের চঞ্চলতায় বাধা দিয়া যদি তাহাদিগকে ধীর ও শান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রদান করা একান্ত বিধেয়, শাস্ত্রকারগণ নদী ও নারীর তুলনা করিয়াছেন। উভয়েরই সমানস্বভাব ; উভয়েরই স্বতন্ত্রভাবে গমন। নদী জলের বেগে কুল ধ্বংস করিয়া থাকে ; নারীগণ চরিত্রদোষে কুলে কলঙ্ক আনয়ন করে। সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদানে বিরত হওয়া ধর্ম্মতঃ ন্যায়বিরুদ্ধ। প্রত্যুত পুত্রগণের ন্যায় কন্যাদিগকেও সযত্নে লালন পালন করিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত যখন শাস্ত্রানুসারে প্রাচীন কালের অনেক রমণীর শাস্ত্রবত্তার পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে তখন তাহাতে আর দোষ কি ? পুনশ্চ ফলাফলের সদসদাশঙ্কায় শিক্ষার প্রকারভেদ সকলকেই মানিতে হইবে। এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষত্ব প্রশংসনীয় ছিল। তিনি ঐ কার্য্যে যোগদান করিয়া উন্নতিকল্পে নিজে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। আশা করি, অগত্যা তাহার সেই ক্ষতিপূরণস্বরূপও "বেথুন" ও "বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বেথুন" বিদ্যালয় সমূহে বঙ্গীয় ললনাগণ চিরকাল আপনাদিগের গুণগ্রাম ও প্রাধান্যের পরিচয় দিতে বিরত থাকিবে না।

অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, তাহাই সমাজ-সংস্কার। তিনি সংসারী ছিলেন ; সংসারের সুখ

দুঃখ বুঝিতেন। দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত; তিনি তাহা বিমোচনের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বাস্তবিক পরদুঃখবিমোচনে লোকের মনে যে বিমল আনন্দময় সুখের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত সুখ। বঙ্গের বিধবা ললনাগণের দুঃখে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইয়া গিয়াছিল; বহুবিবাহপ্রথা তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত দিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই ইহার আভাষ দিয়াছি। এই সময়ে চারিদিকেই বিধবা ও বহুবিবাহ লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। তিনি সুসময়ে সেই আন্দোলন-কার্য্যে যোগদান করিয়া আপনার অপার শাস্ত্রপরিদর্শিতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিতে অনেকেই তাঁহার সহযোগী ও প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি প্রথমে 'বিধবা বিবাহ প্রচলন' ও তৎপরে 'বহুবিবাহ নিবারণ' কার্য্যে যত্নবান্ হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সমাজের অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের সম্মুখে শাস্ত্রকেও অনেকসময়ে অবনতমস্তক হইতে হয়। বঙ্গসমাজ শুনিয়াও তাঁহার কথা শুনিলেন না; কিন্তু বলিতে কি, যাহা অগণ্য পণ্ডিতগণের বুদ্ধির বিষয় হয় নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রের সূক্ষ্মদর্শিতা অনায়াসেই তাহা বাহির করিয়া লইয়া বঙ্গে অতুলনীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কিছু দিন অতীত হইল, অপরাপরের মধ্যে, মণীষিপ্রবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শন ও বিশিষ্টজ্ঞানের অবলম্বনে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও বালবিধবা স্বীয় কন্যার পত্যন্তর গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, কন্যাটীর পুনরপি বৈধব্য ঘটিয়াছে। বিশ্বনিয়ন্তার বিধিলিপি

অখণ্ডনীয়; তথাপি প্রতিভাশালী পুরুষের উদ্যোগে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ক্ষুদ্র শরের ন্যায় অল্পমাত্র স্থান স্পর্শ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করে; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি স্থূল শিলাখণ্ডের মত বহুস্থান স্পর্শ করিয়াও বাহিরেই থাকিয়া যায়, অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

ক্রমে সমাজের আরও নানাপ্রকার কুরীতি ও কদভ্যাস দূরীকরণের চেষ্টায় তাঁহার অন্তর আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিছুদিন ব্যাপিয়া সেই কার্য্যেই লিপ্ত থাকিলেন। এই ভাবে চিরকাল আপনার হিন্দুত্ব ও হিন্দু আচার সংরক্ষণ করিয়া তিনি হিন্দুসমাজে তাঁহার স্থান যে কত উচ্চ অপেক্ষাও উচ্চতম করিয়া গিয়াছেন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই তাহা জানা উচিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আশার পরবশ হইয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহার সেই আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হইল। তিনি নিজের জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের ফল চারিদিকে প্রসারিত হইতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ফলতঃ তিনি গ্রন্থ-প্রচারে ও বিদ্যালয় স্থাপনে যে প্রকার কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গ সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। কলিকাতার মেট্রোপলিটন-বিদ্যালয়, বীরসিংহে বঙ্গবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অপরাপর অনেক স্থলে অনেক রকমের লোক হিতকর কার্য্য করিয়া তিনি দেশের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞ-হৃদয় কেহই কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। সে সকল এখন তাঁহার কীর্ত্তিমন্দিরের অক্ষয় স্তম্ভস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া দেশ উজ্জ্বল করিতেছে।

এই সমস্ত ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি বিধায়ক কার্য্য সম্পাদন

করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় পারিবারিকজীবনে কয়েক দিনের জন্য তাদৃশ সুখী হইতে পারেন নাই। 'ভাই বন্ধু পরিবার' প্রভৃতি পরিবৃত হইয়াই লোক সংসারে সংসারী হইয়া থাকে; এবং তাঁহাদের সুখদুঃখেই তঁহার সুখদুঃখপ্রমাণিত হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাগ্যে সর্ব্বতোভাবে সে সুখ ঘটে নাই। আমরা সেই সমুদায় বিবৃত করিয়া পাঠকগণের ক্লেশ উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি না। সংক্ষেপে দুই চারিটীমাত্র কথা বলিব। সহোদর দীনবন্ধুর সহিত যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে তাঁহার যে কতদূর মনস্তাপ ঘটিয়াছিল তাহা তদীয় তৎকালীন কয়েকখানা পত্রদ্বারাই প্রতিপাদিত হয়। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সহিতও এই সময়ে ঘোর মনোমালিন্য ঘটে; কিন্তু পিতৃভক্ত স্বাধীনচেতা উন্নতমনা হৃদয়বান্ নারায়ণচন্দ্র বেশী দিন আর তন্নিবন্ধন পিতৃদেবের মানসিক ক্লেশ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না; অচিরাৎ স্বকীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দেবাদিদেব পিতৃদেবের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন ও সংরক্ষণ করিলেন। তদ্ব্যতীত অপরাপর কারণেও তিনি নানাপ্রকারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার আন্তরিক প্রবৃত্তি অপ্রতিহতই ছিল; কারণ তাঁহার সহিষ্ণুতা উত্তরোত্তর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে আবার বিপন্নসেবায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন। "বিদ্যাসাগর" এখন এই সকল কারণে—"দয়ার সাগর" হইলেন।

অমরকবি মাইকেল মধুসূদন যে কেবল তাঁহারই সর্ব্বময় সাহায্যে এতদূর উন্নীত হইয়াছিলেন এবং কবিত্বের নিত্যসহচর দারিদ্র্যের নিদারুণনিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও যে কেবল তাঁহার সাহায্যে জীবন-যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন

প্রত্যেক বঙ্গসন্তানেরই তাহা বিদিত থাকা উচিত। বঙ্গভাষা যতদিন জীবিত থাকিবে, বঙ্গকবি যতদিন জগতে সমাদৃত হইবেন ততদিন এই কথা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না। 'কবি' নামের সহিত 'মাইকেল' ও 'মাইকেল' নামের সহিত 'বিদ্যাসাগর' নাম চিরকাল সংশ্লিষ্ট থাকিবে। তিনি সেই দুরন্ত মন্বন্তরের সময়ে ও তৎপরে বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার সময়ে নিপীড়িত দুঃখিগণের যে কতদূর উপকার করিয়াছিলেন তাহা আজপর্য্যন্তও তৎতৎদেশে বিশেষভাবে উদ্ঘোষিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন তিনি যেখানে সেখানে শত সহস্র দরিদ্রলোকের সর্ব্ববিধ অভাব মোচন করিয়া দানশীলতা ও বদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সত্যে মান্ধাতা, ত্রেতায় বলি, দ্বাপরে কর্ণ যে দানশীলতার পরিচয় দিয়া আজপর্য্যন্ত জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন—দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিলে, ঈশ্বরচন্দ্র এই ঘোর কলিকালেও যে তদপেক্ষা অল্প দানশীলতার পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছেন ইহা কেহই বলিবেন না। যদিও আজকাল এদেশে দুই চারিটী বদান্য ও দানশীলের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুলনায় তাঁহাদের কর্ম্ম অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি হয়। বদান্যতা ও দানশীলতার কথা দূরে থাকুক, তিনি সকলপ্রকার সদ্‌গুণেই গুণবান্ ও মহান্ ছিলেন। তাঁহার এক কার্য্যই শতগুণে পরিব্যক্ত হইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিত। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষা মহত্তর ছিলেন, যেহেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন; তিনি তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর ছিলেন, যেহেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; আবার তিনি স্বার্থত্যাগী দানশীল ব্যক্তিগণ

অপেক্ষাও মহত্তর ছিলেন, যেহেতু তিনি দানশীলতাপ্রকাশের সহিত বিষয়-বাসনা ও আত্ম-গৌরবঘোষণার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে সংযত রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতই "দয়ার সাগর" ছিলেন; তাঁহার অপার করুণা একসময়ে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বঙ্গে দীনহীন দরিদ্র-গণের দুঃখসন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল শান্তিসলিলে শীতল করিয়াছিল। তাঁহার অর্থ কেবল দরিদ্রপ্রতিপালনেই ব্যয়িত হইত। এই কার্য্যে তাঁহার আড়ম্বর ছিল না; সংবাদপত্রের দিগন্তব্যাপী প্রশংসাধ্বনির প্রত্যাশায় বা রাজকীয়গেজেটে ধন্যবাদপ্রাপ্তির কামনায় তিনি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন না; তাঁহার কার্য্য নীরবে সম্পন্ন হইত। ধনী তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত ধনরাশির মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ধন দান করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার দান এই দানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সামান্য গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া—দুঃখ দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া, যিনি শেষে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বিলাস সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—তিনি আত্ম-ত্যাগে উপেক্ষা দেখাইয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, অপরের প্রশংসা বা নিন্দা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, কেবল যথার্থ কৃপা-পাত্রদিগের জন্য যে ব্রত পালন করিতেন, সে ব্রত চিরপবিত্র—চিরন্তন ধর্ম্মের মহিমায় মহিমান্বিত—চিরস্থায়ী গৌরবে গৌরব-যুক্ত। তাই বঙ্গের মহাকবি একদিন গম্ভীরস্বরে গাহিয়া-ছিলেন;—"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে—করুণার সিন্ধু তুমি। সেই জানে মনে—দীন যে, দীনের বন্ধু॥"

এইরূপে চিরকাল আপনার হিন্দুত্ব সংরক্ষণ করিয়া, ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণের কালরাত্রির ২টা ১৮ মিনিটের সময় বঙ্গজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া—রজনীর অন্ধকারে বিষাদরাশি

ঢালিয়া দিয়া—বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে হাহাকারধ্বনি তুলিয়া—ঈশ্বরচন্দ্র অমরধামের মনোহরপথে অগ্রসর হইলেন। গৃহে পুত্র কন্যাগণ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল—আত্মীয়-স্বজন শোকে ম্রিয়মান হইয়া মৃত্যুশয্যার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন—অসহায় দুঃখিজন অবলম্বনশূন্য হইয়া ছিন্নতরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া গেল—কিন্তু সহসা তখনি দেবধামের দিব্য-পথে ত্রিদেবের বৈদ্যুতিক আলোক উজলিয়া উঠিল; দেবতাগণ অমরাত্মার সম্ভাষণার্থে অগ্রসর হইলেন; দেবকণ্ঠে বিজয় সঙ্গীত ও মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল; আনন্দকোলাহলে দেবধাম উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অহো, ইহলোকের চারিদিকে ঘোর ঘন অন্ধকার! পরলোকের পথে আনন্দের সৌদামিনীলীলার ছটা! একদিকে অমাবস্যার নিবিড় তামসরাশি! অন্যদিকে পোর্ণমাসী রজনীর সুশীতল জ্যোৎস্নাধারা! একদিকে মহা-শূন্যতা চারিদিক গ্রাস করিল, অন্যদিকে সুপবিত্র জনতাজাত সুমধুর কলনিনাদে চারিদিক নিনাদিত হইয়া উঠিল!

ক্রমশঃ দেবধামের সেই দিব্যবিমানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অনন্তপদে বিলীন হইয়া গেলেন। কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের মনোমন্দির হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার কার্য্যকলাপের সুমহৎ দৃষ্টান্ত চিরকাল আমাদের অন্তরে বিরাজমান থাকিবে। তাই বলি, সেই মহা-পুরুষের মহাদৃষ্টান্ত কি আমাদের উপেক্ষার বিষয় হইবে? আমরা কি ইহাতে কিছুই শিক্ষালাভ করিব না? যিনি লোকহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আমরা কি তাঁহারই উদ্দেশে তাঁহারই পবিত্র নামে, সেই ব্রতপালনে যত্নশীল হইয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না? পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের অপূর্ব্ব-

স্বার্থত্যাগ ও তেজস্বিতার মহাদৃষ্টান্তে সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশ একদিন সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত, ও তেজঃপ্রভাবে অনমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল! আজপর্য্যন্তও সেই মহাগুরু গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রের মহীয়সীশক্তি তিরোহিত হয় নাই। সেই শক্তিতেই একদিন বেদকীর্ত্তিত সুপবিত্র পঞ্চনদে অপূর্ব্ব বীরত্বের বিকাশ দেখা গিয়াছিল! এই সুবিস্তৃত বঙ্গদেশেও যিনি পর সেবাতে সমস্ত বিষয়ের উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশ কি তদীয় স্বদেশবাসিগণের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক হইবে না? তাঁহার সেই সুপবিত্র নামে সদুদ্দেশে, আমরা কি সকলে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিব না? অবশ্যই করিব; আশা আছে সর্ব্বত্রই আবার সেই প্রকার লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে। সেই মহাপুরুষের দৃষ্টান্তে আবার এই দেশে অমৃতপ্রবাহের আবির্ভাব হইবে। আবার এই দেশ হীনতাপঙ্কে নিমগ্ন না হইয়া, মহৎকার্য্যে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে জাতি শত তাড়নাতেও বিচলিত হয় না, শত আঘাতেও বেদনা বোধ করে না, শত উত্তেজনাতেও জাড্যদোষে বিসর্জ্জন দেয় না, সেই জাতি স্বার্থপরতার মোহিনীমায়ায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পরানুগত্য ও পরমুখপ্রেক্ষিতায় আপনাদের হীনভাব না দেখাইয়া এবং সর্ব্ববিষয়ে "নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়" না হইয়া বিশ্ববিজয়ী পুরুষসিংহ সেই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবর্ত্তিতপথের অনুসরণপূর্ব্বক বিশ্বসংসারে আবার প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

22

সম্পূর্ণ।

BENGAL LIBRARY
9-FEB. 1910